"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার সাহায্যকারী হয়ে এই আয়রন এজড় পাহাড়কে গোল্ডেন এজড় পাহাড় করে তুলতে হবে, পুরুষার্থ করে নূতন দুনিয়ার জন্য ফার্স্টক্লাস্ট সীট রিজার্ভ (সংরক্ষণ) করতে হবে"

***প্রশ্নঃ -** বাবার দায়িত্ব-কর্তব্য কি? কোন্ দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য সঙ্গমে বাবাকে আসতে হয় ?*

***উত্তরঃ -** রোগগ্রস্ত আর দুঃখী বাচ্চাদের সুখী করে তোলা, মায়ার ফাঁদ থেকে বের করে পর্যাপ্ত পরিমাণ সুখ দেওয়া - এটা হল বাবার দায়িত্ব-কর্তব্য, যেটা সঙ্গমেই বাবা সম্পন্ন করেন। বাবা বলেন- আমি এসেছি তোমাদের সকলের জন্য সমস্ত অসুস্থতা নিরাময় করতে, সকলের উপর কৃপা করতে। এখন পুরুষার্থ করে ২১ জন্মের জন্য নিজের উচ্চ সৌভাগ্য তৈরী করে নাও।*

***গীতঃ-** ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই*

ওম্ শান্তি । ভোলানাথ শিব ভগবানুবাচ- ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা বাবা বলেন- এটা হল ভ্যারাইটি বিভিন্ন ধর্মের মনুষ্য সৃষ্টি বৃক্ষ । এই কল্প বৃক্ষ বা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য আমি বাচ্চাদের বোঝাচ্ছি। গীতেও এর মহিমা আছে। শিববাবার জন্ম হলো এখানে। বাবা বলেন, আমি এসেছি ভারতে। মানুষ এটা জানে না যে, শিববাবা কখন অবতরিত হয়েছিলেন ? কারণ গীতাতে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। দ্বাপরের তো কথাই নেই। বাবা বোঝান- বাচ্চারা, ৫ হাজার বছর পূর্বেও আমি এসে এই জ্ঞান প্রদান করেছিলাম। এই বৃক্ষের দ্বারা সেকথা সকলের বোধগম্য হয়ে যায়। বৃক্ষকে ভালো করে দেখো। সত্যযুগে বরাবরই দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিলো, ত্রেতাতে রাম-সীতার। বাবা আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বলেন। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে- বাবা আমরা কখন মায়ার ফাঁদে পড়ি ? বাবা বলেন দ্বাপর থেকে। নম্বর অনুযায়ী আবার দ্বিতীয় ধর্ম আসে। তাই হিসেব কষলে বুঝতে পারা যাবে যে এই দুনিয়াতে আমরা সকলে আবার কবে আসবো ? শিববাবা বলেন, আমি ৫ হাজার বছর পরে এসেছি, সঙ্গমে নিজের কর্তব্য পালন করতে। যে কোনো মানুষ মাত্রই সকলেই হলো দুঃখী, তার মধ্যেও বিশেষ করে ভারতবাসী। ড্রামা অনুসারে ভারতকেই আমি সুখী করি। বাবার কর্তব্য হলো বাচ্চারা অসুস্থ হলে তাদের ওষুধ যোগানো। এটা অনেক বড় অসুখ। *সমস্ত রোগের মূল হলো এই ৫ বিকার*। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে কবে থেকে শুরু হয়েছে? দ্বাপর থেকে। রাবণের কথা বোঝাতে হয়। রাবণের দেখা কেউ পায় না। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়। বাবাকেও বুদ্ধি দিয়ে জানা যায়। আত্মা, মন বুদ্ধি সহ হয়। আত্মা জানে যে, আমাদের পিতা হলেন পরমাত্মা। দুঃখ- সুখ, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আত্মা আসে। শরীর যখন থাকে তো আত্মার দুঃখ হয়। এরকম বলা হয় না যে আমি পরমাত্মাকে দুঃখী করো না। বাবাও বোঝান যে, আমারও পার্ট আছে, প্রতি কল্পে সঙ্গমে এসে আমি ভূমিকা পালন করি। যে বাচ্চাদের আমি সুখের মধ্যে পাঠিয়েছিলাম, তারা দুঃখী হয়ে পড়েছে, সেইজন্য ড্রামা অনুসারে আবার আমাকে আসতে হয়। এছাড়া কচ্ছপ- মৎস অবতার এমন ব্যাপার হয়ই না। বলে পরশুরাম কুঠার নিয়ে ক্ষত্রিয়কে মেরেছিল । এই সব হলো মুখের কথা। তাই এখন বাবা বোঝাচ্ছেন আমাকে স্মরণ করো।

এই হলো জগত অম্বা আর জগত পিতা। মাদার আর ফাদার কান্ট্রি বলা হয়, তাই না ! ভারতবাসী স্মরণও করে - তুমি মাতা-পিতা... তোমার কৃপায় গহন সুখ প্রাপ্ত হয়। তবুও যে যতো পুরুষার্থ করবে। যেরকম বায়োস্কোপে যায়, কেউ কেউ ফার্স্টক্লাসের রিজার্ভেশন করায় ! বাবাও বলেন, চাইলে সূর্যবংশী, চাইলে চন্দ্রবংশীতে সীট রিজার্ভ করাও, যে যতো পুরুষার্থ করবে তেমনই পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। তাই সমস্ত রোগের উপশম করতে বাবা এসেছেন। রাবণ সবাইকে দুঃখ দিয়েছে। কোনো মানুষই, মানুষের গতি- সদ্গতি করতে পারে না। এটা হলোই কলিযুগের শেষ। গুরুরা শরীর ছাড়লে আবার এখানেই পুনর্জন্ম নেয়। তাই আবার তারা অন্যের কি সদ্গতি করবে! এতো সব অনেক গুরু মিলিত ভাবে কি পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র করে তুলবে ? গোবর্ধন পর্বত বলে না ! এই মাতা-রা এই আয়রন এজড় পাহাড়কে গোল্ডেন এজড় করে তোলে। গোবর্ধনের আবার পূজাও করে, সেটা হলো তত্ব পূজা। সন্ন্যাসীও ব্রহ্ম বা তত্বকে স্মরণ করে। মনে করে সেটাই হলো পরমাত্মা, ব্রহ্ম হলো ভগবান। বাবা বলেন, এটা তো হলো ভ্রান্ত ধারণা। ব্রহ্মান্ডে তো আত্মারা ডিমের আকৃতিতে থাকে, নিরাকারী বৃক্ষও দেখানো হয়েছে। প্রত্যেক ধর্মের নিজের নিজের সেকশন (ভাগ) আছে। এই বৃক্ষের ফাউন্ডেশন হল ভারতের সূর্যবংশী- চন্দ্রবংশী কুল। আবার বৃদ্ধি হতে থাকে। মুখ্য হলো ৪ টি ধর্ম। তাই হিসেব করা উচিত- কোন্ কোন্ ধর্ম কখন আসে। যেমন গুরুনানক ৫ হাজার বছর পূর্বে এসেছিলেন। এমন তো নয় যে শিখরা ৮৪ জন্মের ভূমিকা পালন করে। বাবা বলেন, ৮৪ জন্ম শুধুমাত্র তোমাদের অর্থাৎ অলরাউন্ডার ব্রাহ্মণদের। বাবা বুঝিয়েছেন

যে, তোমাদেরই হলো অলরাউন্ডার ভূমিকা। ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র তোমরা হও। যারা দেবী-দেবতা হয় তারাই সমস্ত চক্রে আবর্তিত হয়।

বাবা বলেন, তোমরা বেদ-শাস্ত্র তো অনেক শুনেছো। এখন এটা শোনো আর বিচার করো যে, শাস্ত্র রাইট না গুরুরা রাইট নাকি বাবা যেটা শোনান সেটা রাইট ? বাবাকে বলে ট্রুথ(সত্য)। আমি তোমাদের প্রকৃত সত্যি বলছি - যাতে সত্যযুগ তৈরী হয়ে যাবে। আর দ্বাপর থেকে শুরু করে তোমরা মিথ্যা শুনে আসছো তো ওতে নরক তৈরী হয়ে আছে।

বাবা বলেন- আমি তোমাদের গোলাম, ভক্তি মার্গে তোমরা গেয়ে এসেছো- আমি গোলাম, আমি তোমার গোলাম...এখন আমি তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সেবা করতে এসেছি। বাবাকে নিরাকারী, নিরহঙ্কারী বলে প্রশস্ত গাওয়া হয়। তাই বাবা বলেন, আমার দায়িত্ব হলো বাচ্চারা, তোমাদের সর্বদা সুখী করা। একটি গানও আছে 'ঈশ্বরের আসা-যাওয়াতে তাঁর খেলা ব্যক্ত হয়' - এছাড়া ডমরু ইত্যাদি বাজানোর কোনো ব্যাপার নেই। এটা তো আদি-মধ্য-অন্তের সমস্ত সংবাদ শোনায়। বাবা বলেন তোমরা সব বাচ্চারাই হলে অ্যাক্টর্স, আমি এই সময় করিয়ে নিই অর্থাৎ করনকরাবনহার। আমি এর (ব্রহ্মা) দ্বারা স্থাপনা করাই। এছাড়া গীতাতেই যা কিছু লেখা হয়েছে, সে-সবের তো অস্তিত্বই নেই। এখন তো প্র্যাকটিকাল ব্যাপার যে না! বাচ্চাদের এই সহজ জ্ঞান আর সহজ রাজযোগ শেখাই, যোগ-যুক্ত করি। বলে না যে, যোগ যুক্ত করায়, ঝুলি ভর্তি করে দেয়, রোগমুক্ত করে দেয়....। গীতারও সম্পূর্ণ অর্থ বাবা-ই বোঝান। যোগ শেখাই আর শেখাবোও। বাচ্চারা যোগ শিখে আবার অপরকেও শেখায়। বলে যোগ দ্বারা আমাদের জ্যোতি প্রজ্জ্বলনকারী.. এরকম গানও কোনো ঘরে বসে শুনলে সমগ্র জ্ঞান বুদ্ধিতে ঘুরবে। বাবার স্মরণে উত্তরাধিকারেরও নেশা উঠবে। শুধুমাত্র পরমাত্মা বা ভগবান বললেই মুখ মিষ্টি হয় না। বাবা মানেই উত্তরাধিকার।

বাচ্চারা, তোমরা এখন বাবার থেকে আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শুনে আবার অপরকে শোনাও, একেই শঙ্খধ্বনি বলা হয়। তোমাদের হাতে কোনো পুস্তক ইত্যাদি থাকে না। বাচ্চাদের শুধুমাত্র ধারণা করতে হয়। তোমরা হলে সত্যিকারের আত্মা রূপী ব্রাহ্মণ, আত্মাদের পিতার সন্তান । সত্যিকারের গীতার দ্বারা ভারত স্বর্গে পরিণত হয়। সেখানে তো শুধু বসে কথা তৈরী হয়েছে। তোমরা সকলে হলে পার্বতী, তোমাদের এই অমর কথা শোনাচ্ছি। তোমরা সকলে হলে দ্রৌপদী। সেখানে (সত্য, ত্রেতায়) কেউ নগ্ন হয় না। বলে, তবে বাচ্চা কীভাবে জন্মাবে! তোমরা যুক্তি দিয়ে বোঝাবে। এটা তো (ধ্রুপদীর কাহিনী ইত্যাদি) হলো শাস্ত্রের কথা ! আর সেটা হলোই সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। এটা হলো বিকারী দুনিয়া। আমি জানি ড্রামা অনুসারে মায়া আবার তোমাদের দুঃখী করবে। আমি প্রতি কল্পে নিজের দায়িত্ব পালন করতে আসি। তোমরা জানো যে, পূর্ব কল্পে যারা হারিয়ে গিয়েছিলো তারাই এসে নিজেদের উত্তরাধিকার নেবে। প্রতিকূলতাও দেখা যায়। এটা হলো সেই মহাভারত লড়াই। তোমাদের আবার দেবী-দেবতা বা স্বর্গের মালিক হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। এর মধ্যে স্থূল লড়াই এর কোনো ব্যাপার নেই। না তো অসুর আর দেবতাদের লড়াই হয়েছে। সেখানে তো মায়াই নেই যে লড়াই করাবে। অর্ধ-কল্প না কোনো লড়াই, না কোনোই রোগ, না দুঃখ-অশান্তি। আরে, ওখানে তো সমস্ত রকমের সুখ, বাহার আর বাহার থাকে, অর্থাৎ চির বসন্ত । হসপিটাল থাকে না, এছাড়া স্কুলে তো পড়তে হয়। এখন তোমরা প্রত্যেকে এখান থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে যাও। মানুষ পড়াশুনা করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যায়। এর উপর গল্পও আছে- কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমরা কার খাও ? তো বলে আমি নিজের ভাগ্যে খাই। সেটা হলো পার্থিব ভাগ্য। এখন তোমরা নিজেদের অসীম জগতের ভাগ্য তৈরী করো। তোমরা এমন ভাগ্য তৈরী করো যা ২১জন্ম আবার নিজের থেকেই রাজ্য ভাগ্য ভোগ করো। এটা হলো অসীম জগতের সুখের উত্তরাধিকার, এখন তোমরা বাচ্চারা এই কন্ট্রাস্ট ভালো ভাবে জানো, ভারত কতো সুখী ছিলো। এখন কি হাল হয়েছে! যারা পূর্ব-কল্পে রাজ্য-ভাগ্য নিয়েছিলো তারাই এখন নেবে। এরকমও নয় যে ড্রামাতে যা হবে সেটা প্রাপ্ত হবে, তবে তো খিদেয় মরে যাবে। ড্রামার এই রহস্য সম্পূর্ণ বোঝাতে হবে। শাস্ত্রে কেউ কতো আয়ু, কেউ কতো লিখে দিয়েছে। অনেক প্রকারের মত-মতান্তর আছে। কেউ আবার বলে আমি তো সর্বদা সুখীই আছি। আরে, তোমরা কখনো রোগগ্রস্ত হও না ? তারা তো বলে রোগ ইত্যাদি তো শরীরের হয়, আত্মা হলো নির্লেপ। আরে, ব্যথা ইত্যাদি লাগলে তো দুঃখ আত্মারই তো হয় - এটা হলই বোঝার ব্যাপার। এটা হলো স্কুল, এখানে একজন টিচারই পড়ান। নলেজ একই। এইম-অবজেক্ট একই, নর থেকে নারায়ণ হওয়া। যারা পাশ করবে না তারা চন্দ্রবংশীতে চলে যাবে। যখন দেবতারা ছিল ক্ষত্রিয় ছিলো না, যখন ক্ষত্রিয় ছিলো তো বৈশ্য ছিলো না, যখন বৈশ্য ছিলো শূদ্র ছিলো না। এই সব হল বোঝার ব্যাপার । মাতা-দের জন্যও খুব সহজ। একটাই পরীক্ষা। এমন মনে করো না যে দেরীতে আসে যারা তারা কীভাবে পড়বে। কিন্তু এখন তো নূতনরাও তীব্র গতিতে এগোচ্ছে । প্র্যাকটিক্যাল ভাবেই হচ্ছে । এছাড়া মায়া রাবণের কোনো রূপ নেই। তোমরা বলতে পারো অমুকের মধ্যে কামনার ভূত আছে, তবে রাবণের কোনো মূর্তি বা শরীর তো নেই।

আচ্ছা, সব কথার স্যাকারিন হলো "মন্মনাভব" । বলে আমাকে স্মরণ করলে এই যোগ অগ্নি দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা গাইড হয়ে আসেন। বাবা বলেন- বাচ্চারা, আমি তো তোমাদের সামনে বসে পড়াচ্ছি। কল্প-কল্প নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করছি। পারলৌকিক বাবা বলেন, আমি নিজের দায়িত্ব পালন করতে এসেছি- তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সহযোগিতায়। সহযোগিতা করলে তবে তো তোমরাও পদ প্রাপ্ত করবে। আমি কতো বড় বাবা। কতো বড় যজ্ঞ রচনা করেছি। ব্রহ্মার মুখবংশাবলী তোমরা অর্থাৎ সব ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরা হলে ভাই-বোন। যখন ভাই-বোন হয়েছো তো স্ত্রী-পুরুষের দৃষ্টি পরিবর্তিত হয়ে যাবে। বাবা বলেন, এই ব্রাহ্মণ কুলকে কলঙ্কিত কোরো না, পবিত্র থাকার অনেক যুক্তি আছে। মানুষ বলে, এটা হবে কীভাবে ? এরকম হতে পারে না, একসাথে থাকবে আর আগুণ লাগবে না! বাবা বলেন, জ্ঞান তলোয়ার মাঝখানে থাকার কারণে কখনো আগুণ লাগতে পারে না। কিন্তু যখন দু'জনে মন্মনাভব থাকবে, শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকবে, নিজেকে ব্রাহ্মণ মনে করবে। মানুষ তো এই সব কথাকে না বোঝার কারণে গন্ডগোল করতে থাকে, এক্ষেত্রে গালিগালাজও খেতে হয়। কৃষ্ণকে কি আর কেউ গালি দিতে পারে ! কৃষ্ণ এমনিই এসে গেলে তো বিলেত ইত্যাদি থেকে একেবারে এরোপ্লেনে পালিয়ে আসবে, ভীড় জমে যাবে। ভারতে না জানি কি হয়ে যাবে।

আচ্ছা, আজ ভোগ আছে- এটা হলো শ্বশুরবাড়ী। সঙ্গমে দেখা হয়। কেউ-কেউ একে জাদু মনে করে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, এই সাক্ষাৎকার কি ? ভক্তি মার্গে কীভাবে সাক্ষাত্কার হয়, এতে সন্দিগ্ধ বুদ্ধি হতে নেই। এটা হলো একটা নিয়ম মাত্র । শিববাবার ভান্ডারা (ভাঁড়ার) বলে তাঁকে স্মরণ করে ভোগ নিবেদন করা উচিত। যোগে থাকা তো ভালোই। বাবার স্মরণে থাকবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজেকে ব্রহ্মা মুখবংশাবলী মনে করে সুপরিপক্ক পবিত্র ব্রাহ্মণ হতে হবে। কখনো নিজের এই ব্রাহ্মণ কুলকে কলঙ্কিত কোরো না।

২) বাবা সম নিরাকারী, নিরহঙ্কারী হয়ে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পন্ন করতে হবে। আত্মীক সেবায় তৎপর থাকতে হবে।

বরদানঃ- সেবার প্রবৃত্তিতে থেকে মাঝে মাঝেই একান্তবাসী হয়ে অন্তর্মুখী ভব*

সাইলেন্সের শক্তির প্রয়োগ করার জন্য অন্তর্মুখী এবং একান্তবাসী হওয়া আবশ্যক । কোনো কোনো বাচ্চা বলে অন্তর্মুখী স্থিতির অনুভব করার বা একান্তবাসী হওয়ার সময়ই পায় না, কারণ সেবার প্রবৃত্তি, বাণীর শক্তির প্রবৃত্তি অনেক বেশী হয়ে যায়। কিন্তু এর জন্য একসাথে আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা বের করার পরিবর্তে মাঝে মাঝে অল্প সময়ও বের করলে শক্তিশালী স্থিতি হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ- ব্রাহ্মণ জীবনে যুদ্ধ করার পরিবর্তে আমোদে থাকলে মুশকিলও সহজ হয়ে যাবে।*